International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-VI, November 2020, Page No. 19-28
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

নৈতিকতাবোধ ও বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'

অতসী মহাপাত্র
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়
চকশ্রীকৃষ্ণপুর, কুলবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:
Ishwar Chandra Vidyasagar was liberal in his outlook even though he was born in an orthodox Hindu Brahmin family. He was a Philosopher, academic, educator, writer, translator, printer, publishers, social reformer etc. He wrote a number of books that hold primary importance in Bengali Culture. His book 'Borno Parichoy' (Introduction to letter) is still used as the introductory text to learn Bengali alphabets. This was the first book designed on logical principles to teach the Bengali alphabet and moral teaching to the beginners systematically. Morality is the standard of society used to decide what is right or wrong, good or bad behaviors. It protects life and is respectful of others. Moral values refer to the good virtues such as honesty, integrity, truthfulness, helpfulness, love, respectfulness, hard work etc. This paper discusses on Vidyasagar's moral and value added teaching in 'Borno Parichoy' (1st & 2nd part).

Kewords, Bengali Culture, Borno Parichoy', Good virtues, Ishwar Chandra Vidyasagar, Morality

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক প্রাতঃস্মরণীয় মহৎ মানুষের মধ্যে অন্যতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২০-১৮৯১)। তিনি ১৮২০ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা হলেন ভগবতী দেবী। তৎকালীন কুসংস্কারের যুগেও বিদ্যাসাগর জননী ছিলেন আধুনিক চিন্তার অধিকারিণী। পিতা ঠাকুরদাস দারিদ্র্যতা সত্ত্বেও ন্যায়নিষ্ঠা, নীতিপরায়ণতা, অধ্যবসায় ও স্বাধীনচেতা মনোভাব অবলম্বন করে কালক্রমে একদিন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পিতার এই সব গুণ পরবর্তীকালে পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও বিকশিত হয়েছিল। ছেলেবেলায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। শৈশবকাল থেকে তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বজনবিদিত। অসামান্য বিরল গুণের অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্রের মনোবল ছিল অসীম ও দৃঢ়। তিনি সারাজীবন কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে লড়াই করে গেছেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্রের একদিকে যেমন ছিল অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি, অন্যদিকে ছিল চরিত্রের কঠোরতা ও সংগ্রামী মনোভাব। একাধারে তিনি ছিলেন সংস্কৃতের পণ্ডিত, লেখক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারক। সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার, বাংলা শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষার পত্তন হল তাঁর প্রয়াসের অক্ষয়

কীর্ত্তি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পান্ডিত্যের জন্য তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। মনুষ্যত্বের মহৎ উত্তরাধিকার নিয়ে বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর দয়া ও মানবিকতার জন্য তিনি 'করুণা সাগর' নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্মনিষ্ঠা আজও দ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে সমানভাবে প্রসিদ্ধ এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক মনোভাবাপন্ন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পুরানো মূল্যবোধ এবং পরিবারের মধ্য থেকে পরিবর্তন না আনতে পারলে সমাজ ও দেশের কখনোই উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য তিনি বিধবাবিবাহ চালু করা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি মনে করেন নারীজাতির উন্নতি না ঘটলে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির উন্নতি সম্ভব নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তাঁর স্বাধীন চিন্তায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে। তাঁর মতে শিক্ষাকে হতে হবে যুক্তিভিত্তিক। স্ত্রী শিক্ষা ও নারীর উন্নয়নে তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ। শুধুমাত্র নারীশিক্ষা নয়, সমাজে সমগ্র বাঙালি শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ স্বরূপ। বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার এবং সমাজ সংস্কারের তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা। তিনি পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যের সংস্কার ও তার মান উন্নত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'ব্যাকরণ কৌমুদি' প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিশুপাঠ্য হল 'বর্ণপরিচয়' (১ম ও ২য় ভাগ)।

১৮৫৫ সালে বাংলা নববর্ষের দিন যুগান্তকারী বাংলা শিশুপাঠ্য বর্ণমালা শিক্ষাগ্রন্থ 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশিত হয়। শিশুদের 'বর্ণপরিচয়' থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ করেছিলেন তিনি। বাঙালি সমাজে শিশুদের বেদস্বরূপ হল 'বর্ণপরিচয়'। এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালি সাক্ষরতা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও তিনি 'কথামালা', 'বোধোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজ ধাপে ধাপে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল। বিদ্যাসাগর সৃষ্ট বর্ণপরিচয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালির বর্ণের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শিশুর পাঠ্যচর্চার শুভ দ্বারোৎঘাটন ঘটে থাকে, তেমনি শৈশবকালে আদর্শ যাপন, চরিত্র গঠন, নিজ নিজ মনোভাব, পিতা, মাতা, শিক্ষক, শিক্ষিকা, অন্যান্য গুরুজন সহপাঠী বন্ধুবান্ধবদের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকে, যার প্রভাবে কেবলমাত্র শৈশবকালেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব মানুষের মধ্যে সারাজীবন বর্তমান থাকে। তিনি মনে করেন শিক্ষালাভ বলতে কেবলমাত্র পড়াশোনা বা লেখাপড়া নয়। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল জ্ঞানলাভ। তাঁর রচিত বর্ণপরিচয় একদিকে বাঙালি সমাজকে ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিল, তেমনি আবার আমাদের বিচারবুদ্ধি ও নীতিবোধ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা প্রদান করে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে কিভাবে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, ভ্রান্তবিশ্বাস, অন্ধভক্তি প্রভৃতি বর্জন করে যুক্তি, বুদ্ধি ও মননশীলতার আলোকে মানুষের কিরূপ জীবনযাপন করা উচিত, পারিবারিক জীবনে শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্ক, শিক্ষাচেতনা, পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের আচরণ, কর্তব্য, দায়িত্ব প্রভৃতি সম্পর্ক বাঙালি সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন, সেই বিষয়ে একটি ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এককথায় বর্ণপরিচয় কিভাবে শিশুদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ, নীতিশিক্ষা ও চরিত্র গঠনে সহায়ক সে সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাস্তবিক পক্ষে, সভ্য মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একটি উদ্দেশ্য থাকে। শুধুমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসগ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে না। শুধুমাত্র জীবনকে ধারণ করে বেঁচে থাকাই নয়, মানুষের জীবনে একটি গভীর অর্থ রয়েছে। ভিন্ন ভাষায় বলা যায় কেবলমাত্র জীবনধারণের মধ্য দিয়েই মানুষ জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায় না। নিছক অস্তিত্বের মধ্যে মানুষ নিজেকে পূর্ণ বলে মনে করে না। মানুষ তার জীবনের অর্থ ও পূর্ণতা খুঁজেছে আদর্শের মধ্যে, মূল্যবোধের মধ্যে। তাঁর কাছে আদর্শহীন, মূল্যহীন জীবনমাত্রই অর্থহীন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন সৎগুণ (Virtues) নিয়ে বেঁচে থাকাই হল জীবনের আদর্শ। সেই আদর্শ যদি আমাদের জীবনের আনন্দ কেড়ে নেয় কিংবা মৃত্যুকে ডেকে আনে তা হলেও সেই আদর্শ নিয়ে সৎ জীবনযাপন করা উচিত।[১] এইভাবে সক্রেটিস নীতি বা আদর্শের মধ্যে জীবনের অর্থকে খুঁজেছেন। এই আদর্শের অনুসন্ধান করতে গিয়ে গঠিত হয়েছে 'Ethics' বা নীতিবিদ্যা। এই শাস্ত্র আদর্শের স্বরূপকে জানতে চায়; সেই আদর্শের আলোকেই মানুষের কর্ম অথবা সামগ্রিকভাবে জীবনের মূল্যায়ন করতে চায়।

তবে এই আদর্শ বা মূল্যবোধ কবে থেকে মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছে তা বলা কঠিন। কোন কোন মতে মনে করা হয় কোন একটি আদর্শের ধারণা মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে সহজাত হয়েছিল। মানুষ তার নিজ প্রবৃত্তিবশত কতকগুলি নীতির দ্বারা নিজের জীবনকে পরিচালিত করত। ভিন্ন মতে বিবেকের নির্দেশকেই নৈতিক আদর্শ বলে অভিহিত করা হয়। আবার কোন কোন মতে প্রথাকেই মানুষ তার নৈতিক জীবনের আদর্শ বলে মনে করে। তবে সব ক্ষেত্রেই স্পষ্টতা এবং সর্বজনীনতার অভাব ঘটে। সেজন্য সর্বজনীন নৈতিক আদর্শ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাধারণভাবে প্রথাকে নৈতিক নিয়মের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল – নৈতিক নিয়ম কোন বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। নৈতিক নিয়ম সার্বত্রিক – তা সকল মানুষের উপর প্রযোজ্য। কিন্তু সামাজিক প্রথার উপর এরূপ বৈশিষ্ট্য আরোপ করা চলে না। কারণ এক সমাজের প্রথা অন্য সমাজের উপর আরোপিত করা হয় না। কিন্তু নৈতিকতা দেশ, সমাজ বা কালে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল নৈতিকতা। নীতি দার্শনিকরা এই নৈতিকতা বা 'Morality' কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন –

১) নৈতিক নিয়ম হল পরম মূল্যবান। কোনও নৈতিক বিধিকে যখন কতর্ব্য বলে নির্ধারণ করা হয়, তখন তার সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়; এবং সেই কর্তব্য পালনে ব্যক্তির দায়বদ্ধতা স্বীকার করা হয়।

২) নৈতিক বিধিগুলি সর্বজনীন। নৈতিক বিধির দ্বারা নির্ধারিত হয় কোন পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিত।

৩) নৈতিক বিধিকে বুদ্ধিনিষ্ঠ বা যুক্তিনিষ্ঠ বলা হয়। এগুলির ভিত্তি হল কোন ব্যক্তি স্বার্থ, অনুভূতি, প্রবৃত্তি নয়, বরং নৈতিকতা 'Reason' বা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪) মানুষের নৈতিকবোধ আত্মকেন্দ্রিক নয়, এর মধ্যে অন্যের স্বার্থ ও মর্যাদা একই মর্যাদা লাভ করে। সহানুভূতি এবং পরহিতচিন্তা নৈতিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সাধারণভাবে, নীতিবিদ্যা মানুষ কিভাবে সৎ বা নৈতিক হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। মানুষের আচরণ সৎ কিংবা অসৎ হতে পারে। নীতিবিদ্যা একটি আদর্শের আলোকে মানুষের আচরণের

নৈতিক মূল্য নির্ণয় করে থাকে। অধিকাংশ সময়েই মানুষ তার কাজকর্মে নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করে চলে। নিজের কাজকে আদর্শনিষ্ঠ করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। এক্ষেত্রে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে কেন আমরা নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী কাজ করব? তবে এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিশেষ বিশেষ কিছু নৈতিক বাক্য দিয়ে ব্যক্তির নৈতিক শিক্ষার সূচনা ঘটে। যেমন, 'অন্যকে আঘাত কর না', 'তোমার খেলনা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া উচিত' ইত্যাদি নানা নীতিবাক্য শুনতে শিশুরা অভ্যস্ত। বিদ্যাসাগর শিশুদের সাধারণ নীতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ণপরিচয়ে (১ম ভাগ) কতকগুলি নিষেধাত্মক উপদেশ প্রদান করেছেন। এগুলি হল –

১) "কখনো মিছা কথা কহিও না।
২) কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।
৩) কাহাকেও গালি দিত না।
৪) ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।
৫) রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না।
৬) পড়িবার সময় গোল করিও না।
৭) সারাদিন খেলা করিও না।"[২]

আলোচ্য উপদেশগুলি নিতান্তই সহজ, সরল ও শিশুসুলভ হলেও এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মনোভাব ছিল একান্তই মানবিক ও নৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন।

কিন্তু নৈতিক বিধির উৎস না জানলে নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। যেমন, যখন বলা হয় – 'তোমার গুরুজনদের আদেশ পালন করা উচিত', 'সত্য কথা বলা উচিত', 'মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়', 'হত্যা করা উচিত নয়' ইত্যাদি – এই সব ক্ষেত্রে নৈতিকতার মূলে আইনের উল্লেখ করা হয়। কখনোবা নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়। এইভাবে নীতিপালনের স্বপক্ষে কোন যুক্তি বা ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। তবে নীতিবিদ্যায় কেবলমাত্র কতকগুলি নিয়ম পালন করা বা না করার কথাই বলা হয় না, একইভাবে তা একটি আদেশ বা নীতির সৃষ্টি করে, যার দ্বারা আমাদের কর্তব্য নির্ধারিত হয়। এই আদর্শের মানদণ্ডে আমাদের কর্মের মূল্যায়ন করা হয়। বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের (২য় ভাগ) এর বিভিন্ন পাঠে গল্পচ্ছলে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কতর্ব্যগুলিকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বাস্তবিক পক্ষে, সমাজজীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় এই সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, যারা সারাজীবনভর একজন সৎব্যক্তি হওয়ার চেষ্টা করেছে, যে তার নিজের কর্তব্যকর্ম সাধন করেছে, প্রতিবেশীদের ভালো রাখার চেষ্টা করেছে আবার দ্বিতীয় একদল ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যারা তাদের সমগ্র জীবন অন্যায়, অসৎভাবে যাপন করে থাকে। প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ তাকে পছন্দ করে না, এমনকি তাদেরকে সমাজের পক্ষে বিপদজনক বলে মনে করে। সাধারণভাবে প্রথম শ্রেণীর মানুষজনকে নৈতিক, সামাজিক, ভালো, কতর্ব্যপরায়ণ, প্রভৃতি নানা বিশেষণে চিহ্নিত করা হয়; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের উক্ত ধারণা সমূহের বিপরীতে অসৎ, অনৈতিক সমাজবিরোধী নামে অভিহিত করা হয়। এইভাবে উভয় শ্রেণীর মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় পুস্তকে উক্ত দুই শ্রেণির মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুদের চরিত্র গঠনের শিক্ষা প্রদান করেছেন।

বর্ণপরিচয়ের ১৯ পাঠ ও ২০ পাঠে এই চারিত্রিক গঠন, অভ্যাস, শিক্ষা, সদাচার প্রভৃতির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন 'গোপাল' ও 'রাখাল' নামক দুই শিশু চরিত্রের মধ্য দিয়ে। গোপাল সম্পর্কে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, "গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে, যা পায় তাই খায়, যা পায়

তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না। গোপাল আপনার ভাই ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভালোবাসে, সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায়ে হাত তুলে না। এ কারণে তার পিতা মাতা তাকে অতিশয় ভালবাসেন।"[৩] শুধু তাই নয়, 'সুবোধ বালক' নামে খ্যাত গোপাল ছিলেন পড়াশোনায় মনোযোগী, সে পাঠশালায় যাওয়ার সময় পথের মধ্যে খেলা করে না। যথাসময়ে সে পাঠশালায় উপস্থিত হয়। পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে পুরাতন পাঠ মন দিয়ে পড়াশোনা এবং গুরুমশাইয়ের কাছে নতুন পাঠ মনোযোগ সহকারে আয়ত্ত করে। পাঠগ্রহণের পর সাময়িক কালের জন্য খেলাধূলার জন্য ছুটি হলে অন্যান্য বালকেরা যখন খেলাধূলা করে তখন গোপালও খেলাধুলা করে। কিন্তু সে কখনও অন্যান্যদের মতো খেলার সময় ঝগড়া, মারামারি করে না। পাঠশালা ছুটির পর বাড়িতে পৌঁছে সে পাঠ্যবইসমূহ যথাস্থানে রাখার পর হাত মুখ ধোয়ার পর মায়ের দেওয়া খাবার গ্রহণ করে ছোট ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে খেলাধূলা করে। গোপাল ছিলেন পড়াশোনায় মনোযোগী ছাত্র। সে কখনও লেখাপড়ায় অবহেলা করে না। পরের দিন পাঠ্যবিষয়ের পড়াসমূহ যাতে সে সকলের চেয়ে ভালো বলতে পারে সেজন্য সে পুরানো পড়াগুলি দুবেলা আয়ত্ত করে থাকে। সেজন্য বিদ্যাসাগর বলেছেন, "গোপালকে যে দেখে সেই ভালো বলে। সকল বালকের গোপালের মতো হওয়া উচিত।"[৪]

তবে কেবলমাত্র সুবোধ বালকের নমুনাই নয়, মন্দ বা খারাপ বালকের উদাহরণ হিসাবে রাখালের চিত্র অঙ্কণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ণপরিচয় (১ম ভাগ) ২০ পাঠে বলেছেন, "গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। সে বাপ মার কথা শুনে না। যা খুশি তাই করে। সারাদিন উৎপাত করে; ছোটভাই ভগিনীগুলির সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে। এই কারণে তার পিতা মাতা তাকে দেখিতে পারেন না।"[৫] রাখালের মন্দ অভ্যাস সম্পর্কে বিদ্যাসাগর আরও বলেন রাখাল পাঠশালায় যাওয়ার সময় পথের মধ্যে খেলাধুলা করে, মিছামিছি দেরি করে পাঠশালায় যায়। পাঠশালায় পৌঁছে বই হাতে নিলেও একবারও সে পাঠ্যবিষয় মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে না। ফলে সে গুরুমশায়ের সমুখে ভালো পড়া বলতে পারে না। খেলার সময় রাখাল বড় খুশি হয়ে থাকে। খেলার সময় সে বাকী বালকদের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করে ফলত শিক্ষক মহাশয় তার প্রতি সর্বদাই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। পাঠশালা ছুটির পর রাখাল বাড়িতে পৌঁছে পাঠ্যবিষয় যথাস্থানে না রেখে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে, কখনোবা পথের মধ্যে পাঠ্যবিষয় হারিয়ে ফেলে। সেজন্য বিদ্যাসাগর বলেছেন, "রাখালকে কেহ ভালোবাসে না। কোনও বালকেরই রাখালের মতো হওয়া উচিত নয়।"[৬] রাখালের মতো বালকেরা লেখাপড়া শিখতে পারে না। এইভাবে তিনি মন্দ অভ্যাসসমূহ বর্জন ও সুঅভ্যাস গঠনের কথা গল্পাকারে আলোচনা করেছেন।

এইভাবে ভালো মন্দ, উচিত অনুচিত প্রভৃতি নৈতিক ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা অনেক সময় সঠিকভাবে না জানলেও 'নৈতিক' 'অনৈতিক' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার ব্যবহার করে থাকি। যেমন, নৈতিক দায়িত্ব, নৈতিক কর্ম, নৈতিক বাক্য ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে নৈতিক বাক্যের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নৈতিক বাক্য বিশেষ এক ধরণের শব্দ সর্বদা উপস্থিত থাকে, যেমন ঠিক-ভূল, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, কর্তব্য ইত্যাদি। এই জাতীয় শব্দগুলির দ্বারা বক্তার প্রংশসা বা অনুমোদন কিংবা নিন্দা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় মূল্যসূচক শব্দপ্রয়োগের দ্বারা ব্যক্তির আচরণের মূল্যায়ণ করা হয়। যেমন, 'মিথ্যা কথা বলা' মন্দ কাজ, কিংবা 'প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত' ইত্যাদি হল নৈতিক বাক্যের উদাহরণ। তবে প্রথাসিদ্ধ নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। তবে এই জাতীয় নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথাসিদ্ধ কর্মনিয়মগুলির প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার পরিবর্তে সেগুলির পূনরায় বিবেচনাপূর্বক নৈতিক দর্শনের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এর ফলে সুপ্রাচীন কর্মনিয়মগুলি দৃঢ়তর ভিত্তির উপর

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিতে পারে।[৭]

তবে কখনো কখনো নৈতিকতা বোঝাতে একজন ব্যক্তির অথবা গোষ্ঠীর নৈতিক বিধি বা আদর্শমূলক তত্ত্বকে বোঝায়। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যদিও সার্বিক ও মানবিক, তথাপি মানুষের ঐচ্ছিক আচরণেরই নৈতিক মূল্য বিচার করা হয়। কেননা কেবলমাত্র ঐচ্ছিক কর্মের ক্ষেত্রেই মানুষ স্বাধীন। ভিন্ন ভাষায় বলা যায় যে কর্মের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে, যে কর্ম মানুষ আপন ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করে অথবা করে না সেই কর্ম হল ঐচ্ছিক কর্ম। কেবলমাত্র এই জাতীয় কর্মের ক্ষেত্রে ঔচিত্য ও অনৌচিত্য বিচার করা হয়। অনৈচ্ছিক কর্মের নৈতিক বিচার করা হয় না। কারণ এই জাতীয় কর্মের ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। ফলে সেই কাজের দায় কর্তার উপর বর্তায় না। তাই পশুপাখির আচরণ, উন্মাদের আচরণ কিংবা শিশুর আচরণের নৈতিক বিচার হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'নৈতিক' শব্দটি প্রায়শই 'ঠিক' বা 'যথোচিত' এর সঙ্গে সমার্থক হিসাবে বিবেচিত হয়। এবং 'ভূল','অনুচিত','মন্দ'কে অনৈতিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু নীতিবিদ্যায় নৈতিক বলতে নীতিগতভাবে ঠিক বা নৈতিকভাবে বা নৈতিকভাবে ভালকে বোঝায় না। ভাল, উচিত, কতর্ব্যমূলক কর্মের মতো মন্দ, অনুচিত কর্মও নৈতিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। তবে এই দ্বিতীয় প্রকার কাজগুলি নৈতিক হলেও তা নীতিগর্হিত কর্ম। এককথায় বলা যায় স্বেচ্ছাকৃত কর্মের জন্য ভাল-মন্দ, ন্যায় অন্যায়, উচিত-অনুচিত উভয় প্রকার কাজকর্মই নৈতিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য নীতিবিদ্যাকে নৈতিকতা, তার সমস্যা এবং নৈতিক বচন অথবা নৈতিক সমস্যা এবং বচন সম্বন্ধীয় দর্শন বলে অভিহিত করা চলে।[৮]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে প্রথম পাঠে যে সব নীতি ও উপদেশ দিয়েছেন সেগুলি হল –

- "কখনো কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।
- বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। লেখাপড়া শিখিলে সকলে তাহাকে ভালবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না। তুমি কখনও লেখাপড়ায় আলস্য করিও না।
- সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয়, সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাকে ভালবাসে না। সকলেই তাহাকেই ঘৃণা করে। তুমি কখনও মিথ্যা কথা কহিও না।
- নিত্য যাহা পড়িবে নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।
- কদাচিৎ পিতামাতার কথায় অবাধ্য হইও না। তাঁহারা যখন যাহা বলিবেন তাহা করিবে। কদাচ তাঁহাদের অন্যথা করিও না। পিতামাতার কথা না শুনিলে, তাঁহারা তোমায় ভালবাসিবেন না।
- অবোধ বালকেরা সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়, লেখাপড়ায় মন দেয় না। এজন্য তাহারা চিরকাল দুঃখ পায়। যাহারা মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।"[৯]

একইভাবে তিনি বর্ণপরিচয়ের (দ্বিতীয় ভাগ) দ্বিতীয় পাঠে শিশু শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা প্রদানে আরও বলেন –

- "শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।

- পরের দ্রব্যে হাত দিও না। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, চোর বলিয়া তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। চোরকে কেহ প্রত্যয় করে না।
- যে বালক প্রত্যহ মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে, সে সকলের প্রিয় হয়। যদি তুমি প্রতিদিন মন দিয়া লেখাপড়া শিখ, সকলে তোমায় ভালবাসিবে।
- কখনো কাহারও সহিত কলহ করিও না। কলহ করা বড় দোষ। যে সতত সকলের সহিত কলহ করে, তাহার সহিত কাহারও প্রণয় থাকে না। সকলেই তাহার শত্রু হয়।
- যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। অন্যদিকে মন দিলে শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না। অধিক দিন মনে থাকিবে না। পড়া বলিবার সময় ভালো পড়া বলিতে পারিবে না।
- যে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, ঝগড়া করে, মারামারি করে তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না। অভদ্র বালকের সংস্রবে থাকিও না। যদি তুমি অভদ্র হও, কিংবা অভদ্র বালকের সংস্রবে থাকো কেহ তোমাকে কাছে বসিতে দিবে না। তোমার সহিত কথা কহিবে না। সকলেই তোমাকে ঘৃণা করিবে।"[১০]

এইভাবে বিদ্যাসাগর শিশুপাঠ্যের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের কতকগুলি বিধিনিষেধ, নিয়মকানুন তথা নৈতিক অনুশাসন পালন করার নির্দেশ করেছেন এবং এর মাধ্যমে কি করা উচিত কি করা অনুচিত সে সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করেছেন। এর ফলে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ জীবনে সৎচরিত্রের অধিকারী হতে পারে। যারা উপরিলিখিত নিয়ম বা নীতির মান্যতা প্রদান করে থাকে তথা বিদ্যাসাগর নির্দেশিত কর্তব্যপালন করেন তাদেরকে সুশীল বালক বা সুবোধ বালক বলে চিহ্নিত করা হয়; এবং যারা এই নিয়মগুলি অমান্য করেন তাদের অভদ্র বা মন্দ বালক বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বর্ণপরিচয়ের (২য় ভাগ) এর তৃতীয় পাঠে সুশীল বালকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল-

- সুশীল বালক পিতামাতাকে ভালোবাসে, ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করে; পিতামাতার দেওয়া উপদেশের মান্যতা দেয় এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।
- সে (সুশীল বালক) সর্বদা মনোযোগ দিয়ে একাগ্র চিত্তে লেখাপড়া করে; কারণ সে জানে মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া না শিখিলে চিরকাল দুঃখ পেতে হয়।
- সে নিজ নিজ ভাইবোনদের বড়ই ভালোবাসে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করে না, খাওয়ার দাওয়ার পেলে তা ভাইবোনদের সঙ্গে ভাগ করে খায়, একাকী খায় না।
- সে কখনও কারও সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে না। কারণ সে উপলব্ধি করেছে যে মিথ্যা কথা বলে কেউ তাকে ভালবাসে না, কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। সকলেই তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখে।
- সে কখনো কোনও অন্যায় করে না। যদিও সে কখনও বা দৈবাৎ অন্যায় করে ফেলে, সেক্ষেত্রে পিতামাতা শাসন করলে সে তা অবনত মস্তকে স্বীকার করে নেয়।
- সে কখনও কাউকে কটুবাক্য বলে না, মারামারি করে না। সে এমন কোন কাজ করে না যার দ্বারা কারও মনে ক্লেশ উৎপন্ন হয়।
- সে কখনও পরের দ্রব্য চুরি করে না। সে জানে পরের দ্রব্য চুরি করা অন্যায়। যারা চুরি করে সকলে তাকে ঘৃণা করে।

- সে কখনও আলস্যে কাটায় না। যে সময়ের যে কাজ সেই সময়ে সেই কাজ মন দিয়ে করে থাকে। সে লেখাপড়া করার সময় খেলিয়া বেড়ায় না।
- সে কখনও দুঃশীল বালকদের সঙ্গে খেলা করে না, কারণ সে মনে করে দুঃশীল বালকদের সঙ্গে খেলা করলে সেও তাদের মতো হয়ে যাবে।
- সে যখন বিদ্যালয়ে থাকে গুরুমশায় যে সময়ে তাকে যা করতে বলেন প্রফুল্ল চিত্তে সে তা সম্পন্ন করে, কদাচ তার অন্যথা করে না। সে কখনও গুরুমশায়ের কথায় অবাধ্য হয় না। এজন্য সে শিক্ষক মহাশয়ের প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে।

এইভাবে বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের (১ম ও ২য় ভাগ) এর মধ্য দিয়ে শিশুমনে সদাচার অনুশীলন ও মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করেছেন।

অধিকাংশ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে জড়িত থাকে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধ। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল নৈতিক মূল্যবোধ। এই নৈতিক মূল্যবোধ হল তাই যা মানুষকে কিভাবে মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে গড়ে তুলতে হয় সেই শিক্ষা প্রদান করে থাকে। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের মনে এই চেতনার জন্ম দেয় যে যাবতীয় জীবনধারা আমাদের কাম্য হতে পারে না। নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে আমরা ভাল-মন্দ, যথোচিত-অনুচিত প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে থাকি। সেই কাজকে উচিত মনে করা হয় যে কাজ ভালো। আর যা কাজ মন্দ তা অনুচিত। সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, নানান জীবনপ্রণালী থাকতে পারে, কিন্তু নির্বাচন করতে হবে যা কিছু ভালো, সৎ এবং যথোচিত তাকেই। এরূপ বিবেচনার জন্যই একটি নৈতিক প্রেক্ষিতের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধই আমাদের মধ্যে সেই দৃষ্টি জাগিয়ে তোলে, যা আমাদের কর্মকে সংযত করে, মিথ্যাচার ও প্রতারণা থেকে আমাদের দূরে থাকতে বলে। বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের কাছে জীবন শুধুমাত্র ধারণ করার জন্য নয়, তাকে (জীবন) গঠনও করতে হয়। মানুষই মানুষের জীবনকে গঠন করে, তাকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করে।[১১]

তবে, বহুকাল ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় নৈতিকতার সঙ্গে ঈশ্বরে বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এরূপ ধারণায় ঈশ্বরকে নৈতিক জীবনের পরাকাষ্ঠা রূপে চিহ্নিত করা হয়। ঈশ্বরবাদীরা মনে করেন ভালো শব্দের অর্থ হল 'ঈশ্বর অনুমোদিত'। ঈশ্বর হলেন জীবের সুখ দুঃখের নিয়ামক। তিনি জীবের পাপপুণ্য বিচার করে পুরস্কার বা শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। এই ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর চিন্তাধারার মধ্যে। তিনি মনে করেন ঈশ্বর যদি কোনও কাজ অনুমোদন করেন, তবে বুঝতে হবে সেই কাজ ভালো বলেই ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এইভাবেই সৎকর্মের ন্যায্যতা প্রতিপাদিত হয়ে থাকে। তবে পরবর্তীকালে ভিন্ন ভাবধারা গড়ে ওঠে, যেখানে মনে করা হয় মানুষ যে সমাজে বাস করে সেই সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও নৈতিক বিধির দ্বারা সে প্রভাবিত হয়, কিংবা যেগুলি সে অনুসরণ করে সেগুলি নির্দিষ্ট সমাজপ্রেক্ষিত নির্ভর। এই সমস্ত চিন্তাবিদগণ মানুষের নৈতিক জীবনে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ স্বীকার করেন না। অর্থাৎ তারা ঈশ্বরকে কোন নৈতিক মর্যাদা প্রদান করেন নি। মানুষের বিচারবুদ্ধিকেই নৈতিকতার মানদণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিক কালে পিটার সিঙ্গার হলেন এই ভাবধারার বিশেষ সমর্থক। তিনি তাঁর বিখ্যাত "Practical Ethics" গ্রন্থে বলেছেন "Ethics is not something intelligible only in the content of religion. I, shall treat ethics as entirely independent of religion."[12]

উপরিউক্ত দুই ভাবধারার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিতীয় ভাবধারাটিকে তথা সমাজনির্ভর তথা বিচারবুদ্ধি নির্ভর নৈতিকতা সমর্থন করেন। তিনি তাঁর ভাবনাচিন্তায় নৈতিকতাকে ঈশ্বর

বিশ্বাস কিংবা ধর্মালোচনার সঙ্গে যুক্ত করেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঐতিহ্যিক ও রক্ষণশীল পরিবারে। সমাজ সংস্কারের জন্য তিনি যুক্তিও দিতেন হিন্দুশাস্ত্র থেকে। কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে সন্দিহান মনের। কিন্তু তিনি ঈশ্বর বা কোন অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করেন নি। বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে শিশুদের তিনি কোন ঈশ্বর বা ধর্মচিন্তার উপদেশ প্রদান করেন নি। বরং তিনি উক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে সাধারণ নীতিবোধের শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, ঈশ্বরসেবা নয়, মাতাপিতার সেবাই হল শ্রেষ্ঠপুজা এবং এটিই হল সন্তানের সর্বপ্রথম এবং পবিত্র কর্তব্য। শৈশবজীবনে পিতামাতার গুরুত্ব বোঝাতে তিনি বর্ণপরিচয়ের অষ্টম পাঠে বলেছেন, "দেখ, বালকগণ, পৃথিবীতে পিতামাতা অপেক্ষা বড় কেহ নাই। মাতা গর্ভে ধরিয়াছেন। পিতা জন্ম দিয়াছেন। তাঁহারা কত যত্নে, কত কষ্টে তোমাদের লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহারা সেরূপ যত্ন না করিলে, তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত না।"[১৩]

তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে, পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে ধর্ম ও ধর্মনীতিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন। তাঁর কাছে ধর্ম হল মানবধর্ম – 'Religion of Humanity'। নিজ স্বার্থ ব্যতিরেকে সমাজ ও দেশের সেবাই হল তাঁর কাছে প্রকৃত ধর্ম। এটি হল মানবধর্ম। পরোপকার ও মানবকল্যাণই হল মানুষের প্রকৃত ধর্ম। তিনি বিশ্বাস করতেন কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত বড় হতে চান, তাকে প্রথমে সবচেয়ে ছোট কাজটি করা উচিত। কারণ আত্মনির্ভরতাই হল সর্বোত্তম গুণ। আত্মনির্ভর বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারাই মানুষের মধ্যে ধৈর্য্য, সংযম, মনোবল প্রভৃতি মানসিক দিকগুলির বিকাশ ঘটে। বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র হিন্দু ছিলেন না, বাঙালি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন যথার্থ মানুষ ছিলেন। নিছক কর্মজীবন দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর জীবনের অন্যতম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চারিত্রধর্মের শক্তিতে, তাঁর মনুষ্যধর্মের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চারিত্রপূজা' প্রবন্ধে বলেছেন "বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্য সুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহারই সেই পর্বত প্রমাণ চরিত্র মাহাত্ম্য তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।"[১৪]

বিদ্যাসাগর সৃষ্ট বর্ণপরিচয় (১৮৫১) প্রকাশের পূর্বে পর্যন্ত প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যে এরকম কোনও আদর্শ পাঠ্যপুস্তক ছিল না। তাঁর রচিত বর্ণপরিচয়ের মান এত উন্নত ছিল যে, প্রকাশের পর থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে সবার জন্য পাঠ্যবিষয় ছিল। শুধু তাই নয়, ১৫০ বছর পরেও এখনো এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে উক্ত গ্রন্থে আনুষ্ঠানিক ধর্ম, আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখ না করে সাধারণ মানুষের যে সব নীতিবোধ থাকা উচিত সেগুলিকে তিনি গল্পচ্ছলে শিশুমনের উপজীব্য করে পরিবেশন করেছেন। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, আতিথেয়তা, পরোপকার এবং সাধুতার পুরস্কার, অন্যায়ের শাস্তি – এই সবের দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের দৃষ্টিকেও প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। উক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে কেবলমাত্র লেখাপড়া শেখানোর কৌশল, ভাষাশিক্ষাই নয়, শিক্ষার্থীদের নীতিবোধ উন্নত করা এবং আধুনিক দৃষ্টি প্রদানও তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাই বলা যায়, বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম বড় হওয়ার, যোগ্য হওয়ার, মানবিক হওয়ার, নৈতিক মনোভাব সম্পন্ন হওয়ার আধুনিক প্রগতিশীল ও বিশ্বজনীন হওয়ার উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন বর্ণপরিচয়ের মধ্যে। সেই কারণে এই গ্রন্থ পূর্বের মতো মর্যাদা না পেলেও বাঙালি সমাজকে আজও সমৃদ্ধ করে চলেছে।

তথ্যসূত্র:

১) গুপ্ত, দীক্ষিত (২০০২), নীতিবিদ্যা ও ফলিত নীতিবিদ্যা, প্রথম সংস্করণ, সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা ০৯, পৃষ্ঠা- ৩

২) বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র (২০০১), বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, রিসিভার সংস্করণ, বেণীমাধব শীলসÚ লাইব্রেরী, কলকাতা ১, পৃষ্ঠা- ৪০

৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৪

৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬

৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬

৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৮

৭) চক্রবর্তী, সোমনাথ, (১৯৯৮), নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা, প্রগ্রেশিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা- ০৭

৮) ভদ্র, মৃণাল কান্তি (২০০২), নীতিবিদ্যা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পৃষ্ঠা—১৫

৯) বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র (১৯৩৩), বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, ষষ্টীতম সংস্করণ, নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা- ৪

১০) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬

১১) চক্রবর্তী, মালবিকা, (২০১৯) নৈতিকতা ও নিরীশ্বরবাদ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-৬, পৃষ্ঠা- ১৭৬

১২) Singer, Peter (2011), Practical Ethics, 3RD Edition, Cambridge University Press India Pvt. Limited, New Delhi, Page - 03

১৩) বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র (১৯৩৩), বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, ষষ্টীতম সংস্করণ, নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা-২৪

১৪) রবীন্দ্র রচনাবলী (২য় খন্ড) (১৩৯৩), চারিত্রপূজা: বিদ্যাসাগর চরিত, ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা-৭৬৭